**হাইরেদ্দীন বারবারোসা: সমুদ্র ঈগল খ্যাত এক অদম্য মুসলিম বীর**

 রায়হান আহমেদ তামীম

[](https://www.jugantor.com/assets/news_photos/2022/07/05/image-570100-1657013674.jpg)ছবি: সংগৃহীত

উসমানি খেলাফত তথা অটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর প্রায় শতবর্ষ পার হয়ে গিয়েছিলো। ততদিনে তারা প্রবল ক্ষমতাশালী,দাপুটে হিসেবে গোটা ইউরোপে পরিচিতি পেয়েছে। স্থলপথে দিন দিন তাদের শক্তি বেড়েই চলছিলো।

হঠাৎ মনে হলো, স্থলপথের মতো তাদেরকে জলপথেও শক্তিশালী হতে হবে। পূর্বে সেলজুকরা একসময় নৌ-পরাশক্তি হতে চাইলেও বাইজেন্টাইন হস্তক্ষেপ, মঙ্গোল আগ্রাসন এবং নিজেদের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কারণে ঠিক সুবিধা করে উঠতে পারেনি। তবে  সমুদ্রজয়ে উসমানিদের এত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়নি।

১৪৬২ সালে অটোমানরা আনাতোলিয়ার অ্যাজিয়ান উপকূল জয় করার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সমুদ্রযাত্রা শুরু করে। এরপর ধীরেধীরে ভূমধ্যসাগরে তাদের প্রভাব বাড়তে শুরু করে।

নিজেদের নিয়মিত নৌবাহিনী গড়ে তোলার পাশাপাশি সমুদ্রে চষে বেড়ানো ভাড়াটে বাহিনীদেরও কাজে লাগাতো অটোমানরা।  বাহিনীগুলোকে ‘প্রাইভেটিয়ার্স’ নামেও অভিহিত করা হতো। প্রাইভেটিয়ার্সরা ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরে বিভিন্ন যুদ্ধে অবদান রেখে গেছে।

বিশেষ করে ইউরোপিয়ান এবং অটোমানদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধে যোগ দিতো তারা। কখনো কখনো নিজেরাও ভূমধ্যসাগর এবং পূর্ব আটলান্টিকের পণ্যবাহী জাহাজগুলোতে আক্রমণ চালাতো। তবে এসব কর্মকাণ্ডের জন্য কাউকে জবাবদিহিতা করতো না তারা। এভাবেই প্রাইভেটিয়ার্সদের ব্যবহার করে, ইউরোপীয় এবং অটোমানরা নিজেদের প্রক্সি যুদ্ধগুলো পরিচালিত করতো।

**বারবারোসার উত্থান যেভাবে**

সমুদ্র ঈগল খ্যাত হাইরেদ্দীন বারবারোসাও প্রথম জীবনে এরকম একটি ভাড়াটে সৈনিক দলের নেতা ছিলেন, যিনি ইউরোপীয়দের কাছে তার সময়ের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং অভিজ্ঞ জলদস্যু হিসেবে পরিচিতি পান। কিন্ত মূলত তিনি ছিলেন একজন মুসলিম বীর।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়ে ভূমধ্যসাগরের বুক চিরে নিজের রণতরী ছুটিয়েছেন তিনি। এই দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য শত্রু জাহাজে আক্রমণ করেছেন,সেই সঙ্গে অনেকগুলো নৌ-বন্দর তার প্রভাব বলয়ের আওতায় এসে গিয়েছিলো। জাহাজে আক্রমণ এবং বন্দর থেকে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ সম্পদ বারবারোসার হস্তগত হয়ে পড়ে।

বারবারোসা ছিলেন একজন দক্ষ যোদ্ধা, যিনি আরও বড় কিছু হওয়ার জন্যই জন্মেছিলেন। তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাকে সেদিকেই ধাবিত করেছিলো। নিজের যোগ্যতা গুণে একসময়  অটোমানদের মিত্রতে পরিণত হন তিনি। ফলে তার ক্ষমতাও রাতারাতি আকাশচুম্বী হয়ে যায়।

অটোমান সাম্রাজ্যের হয়ে বারবারোসা অসংখ্য নৌ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। বিশেষ করে ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাজতন্ত্র, স্পেনীয় সম্রাট পঞ্চম চার্লসের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তিনি।

বারবারোসার জন্ম ১৪৭৫ সালে, যদিও তার জন্মসাল নিয়ে মতবিরোধ আছে। জন্মস্থান অটোমান শাসনের অধীনে থাকা লেসবোসের পালাইওকিপোস গ্রামে। তার বাবা ইয়াকুব  ছিলেন একজন আলবেনীয় বংশোদ্ভূত ধর্মান্তরিত মুসলিম সিপাহী। অটোমান বাহিনীর লেসবোস দখলের সময় ইয়াকুব অটোমান নৌবাহিনীর সঙ্গে কাজ করেছিলেন। আর তার মা ছিলেন লেসবোসে বসবাসকারী একজন গ্রীক। সেই সময় উসমানিরা তাদের জয় করা অঞ্চলগুলোতে ধর্মীয় উদারতা দেখিয়েছিলো। যার ফলে অনেক স্থানীয় ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো।

শৈশবে হাইরেদ্দীন বারবারোসার নাম ছিলো ‘খিজির’। চার ভাইয়ের মাঝে খিজির ছিলেন তৃতীয়। বাকি ভাইদের নাম যথাক্রমে ইসহাক, অরুচ এবং ইলিয়াস। এদের মাঝে খিজির এবং অরুচের কমলা রঙের দাড়ি থাকার কারণে ইউরোপীয়রা তাদের ‘বারবারোসা ভাতৃদ্বয়’ উপাধি দিয়েছিলো। আর অটোমান সুলতান সুলেইমান খিজিরকে 'খয়ের আদ-দীন' উপাধিতে ভূষিত করেন, যার অর্থ 'ইসলামের শ্রেষ্ঠতম'। পরে সেটা 'হাইরেদ্দীন' হিসেবে অধিক পরিচিতি পায়।

চার ভাই একসময় খ্রিষ্টান জাহাজে আক্রমণকে পেশা হিসেবে নিলেও, তাদের শুরুটা হয়েছিলো ব্যবসায়ী হিসেবে। তারা বাবার কাছ থেকে নৌকা চালানো শিখেছিলো একসময়। সেই দক্ষতা কাজে লাগিয়ে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণের ব্যবসা শুরু করে। বেশ কয়েক বছর একসঙ্গে কাজ করার পর, চার ভাই ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন অংশে নিজেদের আলাদা ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু রোডস দ্বীপভিত্তিক প্রাইভেটিয়ার্স বাহিনী 'নাইট টেম্পলাররা' তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি সাধন করতে থাকে। এরই চূড়ান্ত রূপ হিসেবে টেম্পলাররা মেঝ ভাই অরুচকে বন্দি করে এবং দাস হিসেবে রেখে দেয়। অরুচ দুই বছর বন্দি হিসেবে নিদারুণ কষ্টের জীবন কাটায়। দুইবছর পর  চেষ্টায় টেম্পলারদের কাছ থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। পালিয়ে আসার পর অরুচ ছোট ভাই খিজিরের সঙ্গে মিলিত হন।

খ্রিস্টান জলদস্যুদের শিক্ষা দিতে দুই ভাই মিলে সমুদ্রে ‘পর্যবেক্ষক দল’ গড়ে তোলেন। একে একে তারা অসংখ্য খ্রিস্টান জলদস্যু জাহাজে আক্রমণ পরিচালনা করেন। আক্রমণগুলো সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল অর্থ-সম্পদও হস্তগত করেন বারবারোসা ভাতৃদ্বয়। একসময় তারা নিজেদের শক্তির জায়গাটুকু বুঝতে পারেন।

আর সেটা হলো সমুদ্রে নাইট টেম্পলারসহ অন্যান্য খ্রিস্টান জাহাজ লুট করা। এভাবেই তারা স্পেনীয়সহ অসংখ্য ইউরোপীয় রাজ্যের চোখের বালিতে পরিণত হন।

হাইরেদ্দীন বারবারোসার বড় ভাই অরুচকে ‘বাবা অরুচ’ হিসেবেও অভিহিত করা হতো। কারণ তিনি একসময় আন্দালুস থেকে মুসলিম শরণার্থীদের খ্রিস্টান গণহত্যা থেকে বাঁচাতে নিজের নৌবহরে করে উত্তর আফ্রিকা পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর পর্তুগীজ এবং স্পেনীয় খ্রিস্টানরা উত্তর আফ্রিকা উপকূলে আক্রমণ চালাতে শুরু করে, যা আফ্রিকান আমির এবং অটোমানদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তাই এই আক্রমণের জবাব দিতে অটোমান সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদের পুত্র শাহজাদা কোরকুত অরুচ এবং খিজিরকে ডেকে পাঠান। তাদের কাজ ছিলো পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে খ্রিস্টান নৌবাহিনীকে প্রতিরোধ করা।

কিন্তু ১৫১২ সালে প্রথম সেলিম অটোমান সিংহাসনে বসার পর শাহজাদা কুরকুদকে পারিবারিক কারণে মৃত্যুদণ্ড দেন। নিজেদের সুলতান সেলিমের রোষানল থেকে বাঁচাতে অরুচ এবং খিজির উত্তর আফ্রিকান ঘাঁটিতে আত্মগোপন করেন। সেখান থেকেই তারা স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে আফ্রিকান আমিরদের সহায়তা করতে থাকেন।

১৫১৬ সালে বারবারোসা ভাতৃদ্বয় আলজিয়ার্স আক্রমণ করেন। ফলে এই অঞ্চলটি স্পেনীয়দের হাত থেকে মুসলিমদের হাতে চলে আসে। আলজিয়ার্সকে মুক্ত করার পর অটোমান সুলতানের সুনজরে আসেন দুই ভাই। ফলে এতদিন লুকিয়ে থাকলেও এবার জনসম্মুখে বের হন তারা।

অটোমানরা দুই ভাইয়ের সঙ্গে চুক্তি করার আগ্রহ প্রকাশ করে। যে চুক্তির মাধ্যমে অটোমান সুলতান অরুচকে আলজিয়ার্সের গভর্নর হিসেবে পদোন্নতি দেন। আর খিজিরকে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের প্রধান অ্যাডমিরাল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু অরুচ স্পেনীয়দের সঙ্গে এক সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন।

অ্যাডমিরাল হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর, হাইরেদ্দীন বারবারোসা দুই দশক ধরে উত্তর আফ্রিকা, ভূমধ্যসাগর এবং পূর্ব আটলান্টিকে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। তার কয়েক ডজন রণতরী ছিলো, সেই সঙ্গে নৌ ও স্থলবাহিনীর বিশাল এক বহর। এই বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে ভূমধ্যসাগরে অটোমান প্রভাবকে পাকাপোক্ত করে তোলেন তিনি। তারপর নজর দেন দক্ষিণ ইউরোপের উপকূলবর্তী এলাকায়। আমেরিকার সঙ্গে স্পেনীয়দের বাণিজ্যিক পথগুলো একে একে বন্ধ করে দিতে থাকে তার বাহিনী। এসব নৌ অভিযান থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদও অর্জন করে তারা।

১৫৩৮ সালে পোপ তৃতীয় পল বারবারোসার বিরুদ্ধে একটি নৌ ক্রুসেডের আয়োজন করেন। পোপের নেতৃত্বে পাপাল রাজ্য, স্পেন, জেনোয়া, ভেনিস প্রজাতন্ত্র এবং মালটার নাইটদের সমন্বয়ে একটি যৌথ নৌবাহিনী গড়ে তোলা হয়। যৌথ বাহিনীর নাম দেওয়া হয় ‘পবিত্র সংঘ’। এই বাহিনীর লক্ষ্য ছিলো যেকোনো মূল্যে বারবারোসার নেতৃত্বাধীন অটোমান নৌবাহিনীকে পরাজিত করা।

পোপের নৌবহরের দায়িত্ব দেওয়া হয় অ্যাডমিরাল আন্ড্রে ডরিয়ারের হাতে। এই নৌবহরে ১৫৭টি রণতরী ছিলো। অন্যদিকে বারবারোসার নেতৃত্বাধীন অটোমান বাহিনীর ছিলো ১২২টি রণতরী। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৫৩৮ সালে প্রেভায় সংঘটিত এই নৌ যুদ্ধে বারবারোসার বাহিনীর কাছে পোপের যৌথ বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

অটোমানরা যৌথ বাহিনীর ১০টি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিলো। এছাড়া তাদের ৩৬টি জাহাজ পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে এবং আরও ৩টি জাহাজ অটোমানদের হাতে চলে যায়। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অটোমানদের একটি জাহাজও হারাতে হয়নি। তবে তাদের ৪০০ জন সৈনিক নিহত হয় এবং প্রায় ৮০০ জন সৈনিক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলো।

খ্রিস্টান যৌথবাহিনীর ৩,০০০ নাবিক অটোমানদের হাতে বন্দি হয়। ফলে রাত না পোহাতেই অ্যাডমিরাল আন্ড্রে ডরিয়া নিজ বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেন।

এমন চমৎকার একটি যুদ্ধ জয়ের পর, অটোমান সুলতানের তোপকাপি প্রাসাদ যেন বারবারোসাকে অভ্যর্থনা জানাতে মুখিয়ে ছিলো। তখন অটোমানের সিংহাসনে ছিলেন সুলতান সুলেইমান। তিনি বারবারোসাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাকে পুরষ্কার হিসেবে সমগ্র অটোমান নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল হিসেবে পদোন্নতি দেন।

সেই সঙ্গে উত্তর আফ্রিকা এবং রোডসের প্রধান প্রশাসক হিসেবেও নিয়োগ পান বারবারোসা। পরের বছরগুলোতে বারবারোসা তিউনিস এবং ত্রিপলি অটোমান শাসনের অধীনে নিয়ে আসেন।

**শেষ জীবন**

হাইরেদ্দিন বারবারোসার সারাজীবন কেটেছে সমুদ্রে। একের পর এক লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। চাইলেই নির্বিঘ্ন জীবন বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু সে পথে হাটেননি কখনো। উম্মাহর কল্যানসাধনের মাঝেই খুঁজে পেয়েছিলেন প্রকৃত সুখ৷

পুথিগত বিদ্যার বিবেচনায় তিনি হয়তো বড় কেউ ছিলেন না। কিন্তু তার জীবনটাই হয়ে উঠেছে উত্তরসূরিদের জন্য  হাজারো বইয়ের চেয়ে মূল্যবান কিছু।  
     
১৫৪৫ সালে পুত্র হাসান পাশাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বারবারোসা ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন। তিনি মুরাদি সিনানকে তার আত্মজীবনী লেখার জন্য নির্দেশ দেন। পাঁচ খন্ডে হস্তলিখিত এই আত্মজীবনি সমাপ্ত হয়। এটি সাধারণত গাজাওয়াত-ই-খাইরুদ্দিন নামে পরিচিত।   
সম্প্রতি তুর্কি অধ্যাপক ড. আহমদ সামগিরশিল কাপ্তান পাসানিন সায়ের দেফতরি (ক্যাপ্টেন পাশার লগবুক) নামে এই আত্মজীবনী প্রকাশ করেছেন।

হাইরেদ্দিন বারবারোসার পতাকার শীর্ষে ছিল সুরা আস সাফের ১৩ নং আয়াত। যার অর্থ ‘এবং আরো একটি (অর্জন) যা তোমরা খুব পছন্দ কর। (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।’

আয়াতের নিচে ছিল চারটি তারকা। চার তারকার ভেতরে চার খলিফার নাম। চার তারকার মাঝখানে একটি দ্বিফলা তরবারী যা ছিল জুলফিকারের প্রতিক। নিচে একটি ৬ প্রান্তবিশিষ্ট তারকা। যা তার ইসলাম প্রীতির অনন্য নিদর্শন।

এই মহান যোদ্ধা ৪ জুলাই ১৫৪৬ সালে ইস্তাম্বুলে ইন্তেকাল করেন। তুরস্কের সাধারণ মানুষ আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে তার নাম স্মরণ করে।

**তথ্যসূত্র:**

\* আদ দাওলাতুল উসমানিয়া-- আলি মুহাম্মদ আস সাল্লাবি  
\*খাইরুদ্দিন বারবারোসা-- বাসসাম ইসিলি  
\*দাওলাতে উসমানিয়া-- ডক্টর মুহাম্মদ আজিজ  
\*উইকিপিডিয়া  
\*রোর বাংলা মিডিয়া